মিস্টিরিয়াস ইভেন্টস

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

অন্ধকারে কণ্ঠস্বর 2

ভৌতিক প্রতিচ্ছবি.....14

মৃত মানুষের আঙুল.....27

অন্ধকারে কণ্ঠস্বর

আলোবিহীন একটা অন্ধকার রাত। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমাদের জাহাজ ভাসছে। জাহাজের বর্তমান অবস্থা বলা যাচ্ছে না কারণ হালকা কুয়াশার আড়ালে সূর্যদেব লুকিয়ে আছেন। এই কুয়াশা কখনও মাস্তুল ঘিরে, কখনও নিচে নেমে এসে বিস্তৃত সমুদ্রকে আড়াল করছে। বাতাস নেই, তাই হাতলটা স্থির রেখে ডেকের উপর আমি একা ছিলাম, আমাদের নাবিক দল তিনজন–দুজন পুরুষ, একজন কিশোর। তারা তাদের কেবিনে ঘুমোচ্ছিল। আর উইল–আমার বন্ধু এবং এই জলযানের ক্যাপ্টেন, জাহাজের বাঁ দিকে পিছনের অংশে ছোট কেবিনের বাঙ্কে সে শুয়ে আছে।

হঠাৎ চারিদিকের অন্ধকার ভেদ করে একটা চিৎকার ভেসে এল–জাহাজে কেউ আছেন? আমি ভয় পেলাম। আবার কথাটি ভেসে এল। সে বলল যে, সে একজন বৃদ্ধা মানুষ। সে নির্ভয়ের আশ্বাস দিল।

কথার মাঝখানের ছোট্ট বিরতিটা কানে বাজালো, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম। আমি জানতে চাইলাম যে তাহলে জাহাজের কাছে কেন আসছেন না, সে বলল যে, ভালো হবে। তারপর সব চুপ হয়ে গেল। একমুহূর্ত কান পেতে শুনতে পাওয়া গেল না। আপনি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে কোনো উত্তর না পেয়ে সন্দেহ জেগে উঠল তার মনে। একই সঙ্গে পা দিয়ে আঘাত করে নিচের কেবিনে শোওয়া উইলকে জাগাতে চেষ্টা করলাম। তারপর ডেকের কিনারায় ফিরে এলাম। হলদে আলোয় ছড়িয়ে

পড়লো বিশালতম নিঃস্তব্ধতা। হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর অস্ফুট চিৎকার কানে এল, কেউ যেন অন্ধকার সমুদ্রে আচমকা বৈঠা ডুবিয়েছে। যখন আলোর প্রথম ঝলক ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন জলের উপর কিছু ছিল যা এখন নেই। আমি বললাম যে এটা কোন্ ধরনের ঠাট্টা। রাতের অন্ধকারে নৌকার বৈঠা বেয়ে এগিয়ে যাবার অস্পষ্ট শব্দ। শুধু ডেকের পাটাতনের দরজার দিক থেকে কানে এলো উইলের কণ্ঠস্বর যে জর্জ কি হয়েছে, আমি উইলকে ডাকলাম। উইলকে আমি পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম, উইল অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং বললেন যে নৌকায় কে আছেন। দুবার কথার পর উত্তর এলো।

সে বলল যে, আগে আলোটা সরিয়ে নিন। উইলের নির্দেশে আমি আলোটা সরিয়ে নিলাম। লোকটিকে কাছে আসতে বলল, উত্তরে বৈঠার শব্দ হয়েই চলল। তারপর মোটামুটিভাবে ছ বাঁও দূরে এসে সেই শব্দ আবার থেমে গেলো। উইল বলল যে জাহাজের পাশে আসুন। এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। লোকটি শর্ত দিলেন যে আলো ফেলতে না পারার। আমি তাকে বললাম যে এর কারণ কি? উইল আমার কাঁধে হাত রাখলো, এক মিনিট থেমে চাপাস্বরে উইল বলল,... বলে রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়লো।

উইল বলল যে, এটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি হঠাৎ কোথা থেকে এলেন। আপনার মনের মধ্যে কি আছে সেটা বোঝা যাবে না। আপনি বললেন আপনি একা, সেটা না দেখলে। বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আলোটায় আপনার আপত্তি কি?

ওর কথা শেষ হতেই আবার বৈঠার ছপছপ শুনতে পেলাম তারপর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো এখন অনেক দূর থেকে এবং সে স্বর অত্যন্ত করুণ ও চূড়ান্ত হতাশায় ভরা।

সে বলল যে, সে ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং সে ভীষণ দুঃখিত তাদের বিরক্ত করার জন্য।

উইল তাকে বললেন যে, তাকে সে তাড়িয়ে দিতে চায়নি। যখন তিনি চাইছেন তা, তাহলে আমরা আলো লুকিয়ে রাখছি।

উইল বলল, ব্যাপারটা অদ্ভুত তবে মনে হয় ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। আমি বললাম তা নেই। মনে হয়, এই বেচারা লোকটা বোধহয় জাহাজডুবি হয়ে আশেপাশে কোথায় উঠেছে এবং পাগল হয়ে গেছে।

উইলের কথামতো আলোটা লুকিয়ে রাখলাম। তারপর রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে কান পাতলাম। আলোটা রেখে আমি ফিরে এলাম উইলের পাশে। বারো গজ দূরে এসে বৈঠার শব্দ থামল।

লোকটিকে কাছে আসার জন্য অনুরোধ করা হলো। সে বলল যে, তাদের কাছে যে সে খাবার চাইছে তার দাম দেবার ক্ষমতা তার নেই। উইল বলল, যত খুশি খাবার আপনি নিয়ে যান। সে বলল যে, ভগবান আপনাদের এর পুরস্কার দেবেন। উইল বললেন যে, আপনি যার কথা বললেন তিনি কে? সে বলল যে, সে তার প্রেমিকাকে একা দ্বীপে রেখে এসেছে। সে বলল যে, কোন দ্বীপে তার মনে নেই। উইল বলল যে, তার জন্য একটা নৌকা পাঠানো যায় না। সে বলল যে, তার কর্ম চোখে দেখা যায় না, সে অত্যন্ত দায়ে পড়ে এসেছে। তার কারণ সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না।

রেলিং-এর কাছে উইল ফিরে এলো। দুহাতই খাবারে পরিপূর্ণ। সে জাহাজের পাশে লোকটিকে আসতে বলল। তার বলার সুরে এক সনির্বন্ধ আকুতি খুঁজে পেলাম, তখন হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেয়াল হলো বেচারী বৃদ্ধ মানুষটা এই ঘন অন্ধকারে যে জিনিষগুলোর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেগুলো উইলের হাতে ধরা রয়েছে। আর তা হলেও কোন ভয়ে আমাদের জাহাজের পাশে সেগুলো অদম্য ইচ্ছাকে টুটি টিপে সে সংযত করেছে। সেই ব্যক্তি পাগল নয় বরং সে অসহ্য আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েছে।

আমি মনে করলাম উইল আবেগে ভাসছে। উইল বলল যে, একটা বাক্স নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে যাতে সে লোকটার কাছে পৌঁছে যায়। আমি খানিকপর অস্পষ্ট চিৎকার শুনতে পেলাম এবং বুঝলাম বাক্সটা যথাস্থানে পৌঁছেছে, লোকটি আমাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিল, উইল ও আমার মনে হলো লোকটি আবার ফিরে আসবেন। উইল বলল যে, যতদিন মাছ ধরছি এরকম অদ্ভুত ঘটনা আমার কাছে এই প্রথম। সময় বয়ে চলল। আমাদের চোখে একফোঁটা ঘুমের আমেজ নেই।

প্রায় চার ঘণ্টা পর আবার বৈঠার শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল তিনি ফিরে আসছেন। বৈঠায় শব্দ শুনলাম। সেই লোকটি বলল যে, সে আমাদের ছেড়ে চলে যাবার জন্য দুঃখিত। তার প্রেমিকার জন্য তার খুব তাড়া ছিল। সে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সে বলে চলল, আমি আর আমার প্রিয়তমা আপনাদের উপকারের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভেবেছি– আমাদের হতভাগ্যের কথা। আমরা দুজনে আমাদের জীবনের কথা কারোকে

বলতে চাইনি তবু আপনাদের বলছিলাম। এ কাহিনীর শুরু সেদিন যেদিন অ্যালবাট্রস-এর সমুদ্রসমাধি হয়। যে জাহাজটা নিউক্যাসল থেকে সান ফ্রান্সিসকো রওনা হয়ে যায়।

সে বলল যে, উত্তর দিকে থেকে কয়েক ডিগ্রী দূরে জাহাজটা এক ঝড়ের শিকার হয় এবং তার মাস্তুল ভেঙ্গে পড়ে। যখন ভোর হলো, তখন দেখা গেল জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে। ফুটো দিয়ে তোড়ে জল ঢুকছে। চারিদিক ক্রমে থমথমে হয়ে এলো। নাবিকরা তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নৌকা ভাসান। ধ্বংসস্তূপে আমাকে ও আমার সঙ্গিনীকে ফেলে গেল। আমরা তখন জিনিষপত্র গোছগাছ করছিলাম। অন্ধ আতঙ্ক তাদের নির্দয় করে তোলে। আমরা ডেকের উপর দেখলাম যে দিগন্ত রেখা যেন কালো ফুটকির মতো লাগছে। আমরা অনেক কষ্টে একটা ভেলা তৈরি করলাম। ভেলায় প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ নিলাম এবং জাহাজের ভাড়ার থেকে বিস্কুট সঙ্গে পানীয় জল এবং ভেলায় চড়ে নিরুদ্দেশে রওনা দিলাম। আমাদের জাহাজ অনেকটা তলিয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমরা খেয়াল করলাম আমরা স্রোতের মুখে পড়েছি। সেই স্রোত আমাদের জাহাজ থেকে কোণাকুণি করে নিয়ে চলেছে। প্রায় তিনঘণ্টা পর (হাতঘড়ি দেখে বুঝলাম) জাহাজ ডুবে গেলেও মাস্তুল সমুদ্রের উপরে আছে। আরো কয়েক ঘণ্টা পর তাও ডুবে যায় এবং সন্ধ্যা হয়, কুয়াশা ঘিরে ধরে। এইভাবেই রাত কাটে। পরদিন ভোরে কুয়াশা সরেনি তবে আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা। অদ্ভুত ধোঁয়াশার মধ্যে আমরা চারদিন ধরে বেড়ালাম, অবশেষে চতুর্থ দিন সধ্যায় দূর থেকে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস কানে আসে। ক্রমে সেই শব্দ তীব্র হতে শুরু করে এবং মাঝখানের দু-পাশ থেকে সেই শব্দ

আরো কাছে আসে। জলের ওপর থেকে ভেসে উঠলো ভেলা তারপর আমরা শান্ত জলে এসে পড়লাম। ঢেউ-এর গুঞ্জন আমাদের পেছনে এল।

ভোর যখন হলো তখন আমরা সমুদ্রে ভাসছি আবিষ্কার করলাম। আমরা কুয়াশা ভেদ করে একটা প্রকাণ্ড জাহাজের ইস্পাত শরীর দেখতে পেলাম। আমরা ভেবেছিলাম এই কালো দিন শেষ হলো। কিন্তু তখনও দুর্দশার অনেক বাকি ছিল।

ভেলাটা জাহাজের কাছে পৌঁছাতে আমরা জাহাজের পাশে একটা দড়ি ঝুলতে দেখলাম, ওটা বেয়ে উঠলাম। সেই জাহাজে ছিল কঙ্কালের সমারোহ। ওপরে পৌঁছে রেলিং ডিঙিয়ে জাহাজের ডেকে নামলাম। আমি সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, আমার উদ্দেশ্য ছিল জাহাজের লোকেদের ডেকে সাহায্য চাওয়া। অনেক চিৎকারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন জাহাজের পেছনে উঁচু ডেকের কাছে গেলাম। নিচের দরজাটা খুলে উঁকি মারতে একটা বীভৎস পচা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম ভিতরে সকলে মৃত। নিজেকে হঠাৎ খুব একা বলে মনে হলো।

আমি আমার ভেলার কাছে এলাম যেখানে আমার বাগদত্তা চুপ করে বসে আছে। আমাকে ডেকে সে বলল যে, জাহাজে কেউ আছে কিনা, আমি বললাম যে আমার মনে হয় জাহাজে কেউ নেই। যদি ও একটু অপেক্ষা করে তাহলে মই খুঁজতে পারি যাতে ও উপরে উঠে আসতে পারে। একটু পরে ডেকের অন্য প্রান্ত থেকে একটা দড়ির মই খুঁজে পেলাম। ওটা নিচে ঝুলিয়ে দিলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে ও আমার পাশে উঠে এলো।

আমরা কেবিন ও অন্যান্য ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না। কেবিনের সব জায়গায় ফাংগাসের ঝাড় দেখা গেল। কিন্তু ও বলল এসব পরিষ্কার করা যাবে।

তারপর আমরা জাহাজের পেছনে এলাম। দুজনে মিলে কেবিন ঘসে মেজে পরিষ্কার করে তুললাম। তারপর জাহাজে আমরা খাবার খুঁজলাম এবং তা পেলাম। এবং পানীয় জলের পাম্পটা সারিয়ে তুললাম যাতে পানীয় জলের সমস্যা মিটল তবে স্বাদটা মধুর ছিল না। বেশ কদিন আমরা সেখানে ছিলাম কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কি অভিশাপ লুকিয়ে আছে। আমরা কেবিনের দেওয়ালে ও মেঝেতে, জায়গায় জায়গায় গজিয়ে ওঠা ফাংগাসের আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলেছিলাম কিন্তু আশ্চর্য যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় সেগুলো আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। এটা আমাদের মধ্যে হতাশা তৈরি করলো। আমরা কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ওগুলো নির্মূল করে তুললাম। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে তা আগের সঙ্গে অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়লো। যেন আমরা হাত দেবার ফলেই ওগুলো থেকে অসংখ্য বীজাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাতদিন পর দেখা গেল ওর বালিশ, মুখের কাছে জড়িয়ে আছে ফাংগাস। সে আমার কাছে এটা দেখালে আমি ঠিক করলাম যে ঐ মুহূর্তে জাহাজ ছেড়ে চলে যাব যাতে জলের চেয়ে ডাঙায় ভালো করে বাঁচতে পারি।

নিজেদের সামান্য জিনিষ গুছিয়ে নিলাম। আমার সঙ্গিনীর শালের মধ্যে থাকা ফাংগাসগুলো নিজের হাতে সরিয়ে দিলাম।

ভেলাটা জাহাজের গায়ে ভাসছিল, ওটা চালাতে অসুবিধে হতে পারে বলে জাহাজের ডেক থেকে একটা ছোট নৌকো জলে ভাসানো হলো। নৌকা করে আমরা ডাঙার দিকে রওনা হলাম। ডাঙার কাছাকাছি আসতে দেখলাম ফাংগাস দূষিত রাজত্ব অবাধে বিস্তার করেছে, কোনো কোনো জায়গায় ওগুলো বীভৎস অকল্পনীয় টিবির মতো হয়ে আছে। স্থির গাছের পাতা বাতাসে যেমন কেঁপে ওঠে, সেগুলো থরথর করে কাঁপছে। এখানে ওখানে সেগুলোর চেহারা মোটা আঙুলের মতো, কোথাও কোথাও সমতলে মসৃণভাবে বিশ্বাসঘাতী রূপ নিয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়েছে, দু-এক জায়গায় ফাংগাসগুলো বেড়ে উঠেছে ও জঘন্য ভাবে কেঁপে উঠছে।

আমরা তীর ধরে খানিকটা যাবার পরে ফাংগাসের আক্রমণ থেকে যে মুক্ত নই সে ভুল ভাঙে। আমরা খানিকটা যাবার পর যে ছোট জায়গাটা দেখলাম সেটা সূক্ষ্ম সাদা বালিতে ঢাকা। কিন্তু সেটা সঠিক বলি কিনা তা বোঝা যায় না। তবে এখানে ফাংগাস ছিল না। এই বালি জাতীয় জিনষটা যেদিক দিয়ে চলেছে তার দুপাশে ভয়ঙ্কর ফাংগাসের ঝাড়। ওই গোটা দ্বীপে জঘন্য বীভৎস, আগাছার জঙ্গল, রক্তবীজের রাজত্বের বুক চিরে সাদা সাদা পথ ছিল। এই জায়গাতে আমরা সব জিনিষপত্র নামালাম। তারপর কতগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে পাল খুললাম ও ছোট তাঁবু তৈরি করলাম। সেগুলোর চেহারা ভালো না হলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো। সেখানে আমার চার সপ্তাহ নির্বিঘ্নে কাটাই।

প্রথমে আমার সঙ্গিনীর ডান হাতের মধ্যে একটা ধূসর রঙের মাংসপিণ্ড দেখা যায়। আমি আতঙ্কিত হয়ে কার্বলিক অ্যাসিড ও জল দিয়ে সেটা পরিষ্কার করলাম। সকালে হাত দেখে বেশ ভয় পেলাম কারণ আবার সেখানে আঁচিলের মতো দেখতে পেলাম। হঠাৎ

গালের মাঝখানে সোনার মতো ছিল। কানের কাছে, চুলের নিচে স্পর্শ করে ওটা কি আমি অনুধাবন করলাম। আমরা দুজনে আমাদের গালের ওই ক্ষতটা যে কি বুঝতে পারছিলাম। আমরা সেখান থেকে পালাব মনে করেছিলাম। ভাবলাম জিনিষপত্র পানীয় জল নিয়ে আমরা সমুদ্রে পাড়ি দেব। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম আমরা সংক্রমিত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা দ্বীপেই থাকব স্থির করলাম।

একমাস থেকে তিন মাস কেটে গেল–এই ফাংগাসের বাড়ি আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যে নিঃসীম আতঙ্কের সঙ্গে আমাদের স্নায়ুর লড়াই চলেছে তাতে ফাংগাসের অগ্রগতিকে আর যাইহোক বীর বলে মনে হয় না।

কখন কখন প্রয়োজনীয় জিনিষের খোঁজে গেছি সেই জাহাজে। সেখানে দেখি ফাংগা একঘেয়ে ভাবে বেড়ে চলেছে। ডেকের একটা গাছ প্রায় আমাদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। ছেড়ে যাবার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমরা জানি এই অসুখ নিয়ে সুস্থ সমাজে মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

আমরা বুঝতে পারলাম খাবারের রেশন ফুরিয়ে আসছে। তাই খাবার কম করে খরচা করতে হবে। তখন যখন আমরা খাবারের সঞ্চয় শুরু করলাম তখন দেখলাম যে যে রুটির টিনগুলো আমরা ভর্তি ভেবেছিলাম সেগুলো খালি। এছাড়া টুকিটাকি মাংসের টিন, তরিতরকারী ভরসা করার মতো নেই।

পরিস্থিতি জানার পর আমরা সমুদ্রে মাছ ধরলাম। এই ঘটনায় যখন ক্রমশঃ মরিয়া হয়ে উঠেছি, তখন মনে হলো সমুদ্রে মাছ ধরার কথা। মাছ পেলেও আমাদের ক্ষিদের কাছে তা কিছু বোধ হলো না। চার মাস এমনি করে কেটে গেল।

তার পর আমরা ভয়ঙ্কর একটা আবিষ্কার করলাম যেটা ছিল বিস্কুট। কিন্তু ওটা ফাংগাস ছিল। ওটা হাতে নিতে ওর মুখে নেমে এলো মৃতমুখের পাণ্ডুর ছায়া। ওর মুখ গোলাপের মতো লাল হলো। ওর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনলাম, যে গতকাল ও নাকি ফাংগাস খেয়ে নিয়েছে এবং ওর ভালো লেগেছে। ওকে আমি বারণ করলাম যে যত খিদেই পাক না কেন ও যেন ফাংগাস স্পর্শ না করে। প্রতিজ্ঞার শেষে সে বললো ওই ফাংগাস খাওয়ার ইচ্ছেটা ওর মনে দমকা হাওয়ার মতো এগোচ্ছিল। অথচ তার মনে এর আগে ওগুলো খাবার কোনো ইচ্ছে জাগেনি। আমি তারপর পথ দিয়ে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ বালি থেকে বিচিত্র শব্দ পেলাম। ফাংগাসের একটা ঝাড় আমার কনুই-এর কাছে নড়াচড়া করছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো ঝাড়টার আকৃতির সঙ্গে কোন বিকৃতদেহ মানুষের মিল রয়েছে। মাথায় এই চিন্তাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী শব্দ এলো। জিনিষটার মাথা আকারহীন একটা ধূসর বল। বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ফাংগাসের তাল আঁকড়ে ধরলাম। তারপর কিছুতেই আমার আর তৃপ্তি হয় না। গোগ্রাসে খাওয়ার মাঝখানে সকালের আবিষ্কারের কথাটা আমাকে ভাবল। তারপর নিজের প্রতি ঘৃণায় ফাংগাসের টুকরোটা ফেলে দিলাম। আমাকে দেখে ও সব বুঝলো এবং সে আমাকে নীরব সহানুভূতি জানাল। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম। কিন্তু অদ্ভুত ফাংগাসটার কথা গোপন করে গেলাম। আমি আতঙ্কের বোঝা বাড়ালাম না।

আমি বুঝলাম আমি যা দেখেছি তা ওই সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়ানো জীর্ণ জাহাজের যাত্রীদের কোনো একজনের ভয়াবহ পরিণতি, আর একই পরিণতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এরপর আমরা ঐ জঘণ্য খাদ্য এড়িয়ে চললেও দিনের পর দিন উদ্দাম গতিতে ফাংগাসের পরগাছা দেহটাকে দখল করলো। আমরা বংশবৃদ্ধিতে বাধা দিতে পারলাম না। সুতরাং দেহ দিনে দিনে ফাংগাসে পরিণত হলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে পুরুষ-নারী বুঝতে পারলাম।

আর দিনের পর দিন আমাদের লড়াই একটা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ঐ কালান্তিক ফাংগাস মুখে দেবার কামনা আমরা রুখতে পারবো না।

এক সপ্তাহ আগে আমরা বিস্কুট খেয়েছি এবং তিনটি মাছ ধরেছি। আজ রাতে মাছ ধরতে এসে আপনাদের নৌকা দেখতে পেলাম। তখন আপনাদের ডেকে আপনাদের দেওয়া খাবার খেলাম। পতিত দুই আত্মাকে সহানুভূতি ও দয়া করবার জন্য ভগবান আপনাদের বঞ্চিত করবেন না।

জলে বৈঠা ডোবানোর শব্দ পাওয়া গেল, শেষবারের মতো কণ্ঠস্বর এলো। হালকা কুয়াশা ভেদ করে আসা ভৌতিক স্বরে বিষণ্ণতা এলো–আমি বিদায় নিলাম।

আমি দেখলাম যে ভোর হয়ে এসেছে। চাপা আলোয় নৌকা দূরে যেতে দেখলাম। মনে হলো একটা পাতের ভেলা ভাসছে। বৈঠা দুটো জল ঠেলে চলল। আমার দৃষ্টি পড়ল মাথার উপর। বৈঠা জলে ডুবলো। নৌকাটা আলোর বৃত্তের বাইরে, ঐ জিনিষটা স্পঞ্জের বলের মতো কয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভৌতিক প্রতিচ্ছবি

কারোর চুরুট চাওয়ার পর আমি চকিতে লোকটার দিকে ফিরে তাকালাম। পরক্ষণেই আমি ওকে চিনতে পারলাম। বছর পঁয়ত্রিশ-এর ব্রিসবেন। মাথায় জফুটের মতো, হয়তো একটু বেশি হবে। বেশ দোহারা চেহারাটি, বেশ চওড়া কাঁধ। হাতের পেশী এত শক্ত যে বাদাম ভেঙে ফেলতে পারে। বুকটা ইস্পাতের মতো কঠিন। ভেতর থেকে খুবই শক্তিশালী। আয়ত নীল চোখ, খাড়া নাক এবং পাতলা গোঁফ, পরিষ্কার চিবুক, সব মিলিয়ে চেহারাটা পুরুষালী। ব্রিসবেন যখন কথা বলে তখন সবাই একমনে তার কথা শোনে।

সে বলছিল যে, সে সমুদ্র ভীষণ ভালোবাসে। সে একজন ভদ্রলোককে জানত যে বিশেষ একটা বাস ধরার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ব্রডওয়েতে অপেক্ষা করতো। সেও তার মতো আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য একটা বিশেষ জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতো। সেটার নাম ছিল কামশ্চাকা। সেটা তেমনি বড় এক সুন্দর। নানা ধরনের সুযোগসুবিধা ও অসম্ভব দ্রুতগতির জন্য সেটা তার প্রিয় ছিল। জীবনে একবারই তার সঙ্গে কামশ্চাকা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারপর থেকে আর তার ছায়া মাড়ায়নি।

গ্রীষ্মের এক উষ্ণ সকালে যে কোন কারণে দেরী করে ফেলে। তখন জাহাজ ছাড়তে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। আসন না থাকলেও পূর্ব পরিচয়ে সে একটা টিকিট জোগাড় করে। একজন পরিচিত স্টুয়ার্ট দেখে মাঝপথে ধরতে সে বলল, ১৩৫ নং বার্থ।

বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে স্টুয়ার্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমার পোর্টমানটা ও লম্বা কালো ওভারকোট আর কম্বলটা তুলে নিলো। তার মুখের অভিব্যক্তি সে কোনোদিন ভুলবে না। তাকে দেখে তার মনে হলো যে সে হয়তো কেঁদে ফেলবে নয়তো আমার হাত থেকে পোর্টমানটা ফেলে দেবে। কেঁদে ফেললে কিছু হবে না কিন্তু পোর্টমাল্টা ফেলে দিলে খুবই ক্ষতি হবে। কেননা ওর মধ্যে তার বন্ধু বান পিকিনসের দেওয়া দুবোতল শেরী আছে।

এগিয়ে ও নিচু গলায় বলল যে, আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হারমিস যেন একটা নেশার ঝোঁকে রয়েছে। আমি নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলাম, ১৩৫ নং বার্থটা জাহাজের পেছনে বাঁ-পাশে, অন্যান্য জাহাজের নিজস্ব বা নিভৃত কেবিনগুলো যেমন হয় এটা ঠিক সেই রকম। এতে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

এটা নিচের বার্থ তাই চওড়া বেশি ওপরের বার্থের থেকে। এখানে বহুবার যাতায়াত করেছি, কখনও নিচের কেবিনে থাকতে হয়নি। আমার মনটা প্রথম থেকেই খিঁচড়ে ছিল, সমুদ্র ঝঝির সোঁদা গন্ধে আমার দম বন্ধ হচ্ছিল।

লটবহর নামিয়ে হারমিস এমন মুখ করে তাকিয়ে ছিল যেন তার খুব দরকারী কাজ আছে। আমি তাকে ভালো বকশিস দিতে সে বলল যে, সে ভালো বার্থের জন্য চেষ্টা করবে। মুদ্রাটা পকেটে পুরতে তার মুখটা এমন হলো যাতে আমি অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম যে হয়তো ওদের বকশিসের হার বেড়ে গেছে তাই ও সামান্য কটা টাকায়

খুশী হয়নি। আমার মনে হলো মাল পেটে পড়লে ওর মেজাজটা ঠিক হবে। কিন্তু আমার অনুমান যে কত ভুল ওর প্রতি যে অবিচার আমি করেছিলাম।

সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটলো না। আমরা বন্দর ছেড়ে যাত্রা শুরু করি। আবহাওয়া ভারী চমৎকার ছিল। যাত্রার প্রথম দিন সবাই সমুদ্রকে ভালোবাসে এবং হালকা পায়ে ঘুরে বেড়ায়। টেবিলে আড্ডা বসেছিল আবার ফাঁকাও হলো। ফায়ার আইল্যাণ্ড পেরোবার পর ভারী চমৎকার একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল। চোখে পড়ছিল তিমি ও ভাসমান তুষার শিলা। কিন্তু যারা আটলান্টিক বহুবার পার করেছেন তাদের কাছে এসব কোনো নতুন মনে হবে না। তাদের কাছে সব চাইতে আনন্দদায়ক ডেকের কুর্সিতে গা এলিয়ে ধূমপান করা।

সেদিন ভীষণ ক্লান্তি বোধ করাতে নিচের কেবিনে আসতে আমার কেবিনে আর একজন সহযাত্রীর দেখা পেলাম, যার আমার মতো একটা পোর্টমানটা রয়েছে, ওপরের বার্থে সুন্দর করে গোছানো একটা ভাঁজ করা কম্বল, ছড়ি আর ছাতা। আমার স্বাধীনভাবে যাওয়া হবে না ভেবে দুঃখ পেলাম।

আমি ডাকলাম লোকটা কখন ঢুকল, এবং ঢুকলো যখন এত তাড়াতাড়ি কি করে ঘুমিয়ে পড়লো। দেখে মনে হলো যে লোকটা বেশ লম্বা, রোগা, ফ্যাকাশে চেহারা। বালি রঙের কটা চুল, ধূসর চোখ। পুরানো ধাঁচের একটু বেশি পোশাক পরা, সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের উপস্থিতি যেন কেমন সন্ধিগ্ধ।

এইধরনের চরিত্রের বাস ওরাল কীটে, আঙ্গলাইসে যে একের পর এক শ্যাম্পেন উড়িয়ে চলেছে। এই ধরনের চরিত্রের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, এধরনের দুটো-একটা চরিত্রকে আমি এড়িয়ে চলাই পছন্দ করি। আমি ওর আগে শোবো, এবং ওর পরে উঠবো বা তার বিপরীত কাজ করবো। কারণ ওর সঙ্গে আলাপ করার আমার প্রবৃত্তি নেই। দূর থেকে ওর কার্যবিধির ওপর নজর রাখব। তা করতে হয়নি কারণ প্রথম রাতের পর ১০৫ নং, ওকে দেখিনি।

বেশ গাঢ় ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ মাঝখানে এটা প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ শুনে মনে হলো যে আমার সহযাত্রী ওপরের বার্থ থেকে মেঝেতে লাফিয়ে পড়েছে। পরক্ষণেই ছিটকিনি খোলার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলার আওয়াজ। তারপর প্যাসেজে দ্রুত ছুটে যাওয়া পায়ের শব্দ কানে এলো। কেন জানি না জাহাজটা বেশ জোরে দুলছিল এবং প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। জাহাজের ক্যাচকেচে আওয়াজ আমাদের উত্যক্ত করে তুললো। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে আমি দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আমি উঠলাম। যখন উঠলাম তখন বেশ অন্ধকার।

বেশ স্যাঁতসেতে আবহাওয়া–আমার শীত করতে লাগল। আমি ভাবলাম যে কাল ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানাব যে সমুদ্র ঝঝির গন্ধের জন্য। আমি সহযাত্রীর আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং তার জন্য আমি কিছু করলাম না কারণ আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম।

ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরে। জাহাজটা ভীষণ দুলছিল। বেশ ঠান্ডা লাগছিল। কিন্তু জুন মাসে কেন যে এত শীত করছিল কে জানে। কম্বলের ভেতর দিয়ে পোর্টফোলিওর দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেলাম। ওটা খোলা ছিল। আমি বন্ধ করে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই ভদ্রলোক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। আমি এই সুযোগে কেটে পড়তে চাইলাম। তাই আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে ডেকে চলে এলাম। তখন সাতটা বাজে। দেখলাম, এক ডাক্তার রেলিং-এ ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। যিনি জাতিতে আইরিশ। কালো চুল এবং টলটলে নীল দুটো চোখ।

তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমি যখন বললাম ১০৫ নং বার্থের ওই স্যাঁতসেতে ঘরটা আমার; তখন তিনি যেভাবে দেখলেন সেটা একটা অদ্ভুত লাগল। ডাক্তার বললেন যে, নিচের ওই কেবিনটা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আমি বললাম এই নিয়ে আমারও অভিযোগ কম নয়। যে এইখানে আলো বাতাস অত্যন্ত কম। অবশ্য ডাক্তার আমাকে ভয় পাওয়াতে চাইছিলেন না। স্যাঁতসেতে কুয়াশায় আমার খুব একটা অসুবিধা হবে না। ডাক্তার আমাকে সহযাত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমি বললাম যে, একজন ছিলেন, তবে তাকে ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছিল না। সে মাঝ-রাত্তিরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছিল।

ডাক্তার বললেন যে সে কি আবার ফিরে এসেছিল। আসলে আমি দেখিনি কেননা শীতে আমি কম্বলের নিচে ছিলাম। সকালে উঠে আমি পোর্টফোলিওটা খোলা দেখি।

ডাক্তার বললেন যে, সম্প্রতি নানাকারণে জাহাজটির দুর্নাম ঘটেছে এবং তিনি আমাকে তার কেবিনে যেতে অনুরোধ করলেন।

আমি অবাক হলাম জাহাজ সম্পর্কে ওভাবে বলাতে। আমি ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানালাম। আমার জানতে ইচ্ছে করছিল তিনি কেন জাহাজ সম্পর্কে এটা বললেন। তবে ঘর ঝাড়পোছ করে বাস করতে আমি আগ্রহী ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, কেন তিনি একথা বললেন?

তিনি বললেন যে, সমুদ্র মানুষকে সংস্কারবাদী হতে সাহায্য করে। এর আগে তিনজন যাত্রী তিনবার ১০৫ ঘরে ঘুরিয়ে থাকার পর আত্মহত্যা করেছে।

মনে মনে আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু তিনি ঠাট্টা করছিলেন না, বরং গভীর চিন্তায় ভরা মুখটা কাঁপছিল। আমি তার প্রস্তাবে আগ্রহী হলাম না। কেবিনে থেকে যারা আত্মহত্যা করেছেন তাদের থেকে যে আমি আলাদা এটা প্রমাণ করতে চাইছিলাম। ডাক্তার প্রতিবাদ না– করে প্রস্তাবটা একবার বিবেচনা করতে চাইলেন।

প্রাতঃরাশের সময় একটা বই নিয়ে আমার জন্য তিনি নিচের কেবিনে গেলেন। দেখলাম উপরে বার্থের পর্দাটা আগের মতো টাঙানো রয়েছে। কোনো শব্দ পাচ্ছিলাম না। আমি বইটা নিয়ে আসছিলাম, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন ভেবে! জাহাজের ক্যাপ্টেনে আমায় ডেকে বললেন যে আমার সহযাত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হলো ভদ্রলোক সমুদ্রে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। এটা ক্যাপ্টেনকে বলতে তিনিও সহমত হলেন। কারণ

এটা নিয়ে চারজন হলো। আমি আগের দিন রাত্রির ঘটনাটা তাকে বললাম। ক্যাপ্টেন বললে যে, তিনজনের মধ্যে যে দুজন যাত্রী আছে তাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন। ওরা মাঝ-রাত্তিরে দরজার ছিটকিনি খুলে প্যাসেজ দিয়ে ছুটতে শুরু করেন। জাহাজ থামিয়ে নৌকা থামিয়ে হদিশ পাওয়া যায়নি। গত রাত্তিরের ভদ্রলোক সম্পর্কে কেউ কিছু দেখতে বা শুনতে পায়নি। রবার্ট বা একটু আগে যে স্টুয়ার্টটি আমায় ডেকে আনল সে অত্যন্ত কুসংস্কারবাদী। তার ধারণা জাহাজে অদ্ভুত কিছু ঘটেছে। সকালে নিচের কেবিনে পরিষ্কার করতে গিয়ে সে সেটা ফাঁকা দেখে। কিন্তু ওর ধারণা জাহাজে অদ্ভুত কিছু ঘটেছে যার জন্য লোকটি নেই।

ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন যে, জাহাজ সম্পর্কে একটা গুজব রটেছে যে এই জাহাজে যাত্রীরা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু আপনি এ ব্যপারটা কারোকে জানাবেন না। এই খবর শুনলে যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। তাই আপনি জাহাজের কর্মচারী কেবিনে থাকতে পারেন, এরজন্য আপনাকে একটুও কুণ্ঠিত হতে হবে না।

ক্যাপ্টেনকে জানালাম, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি বললাম যে, সহযাত্রীর জিনিষগুলো সরিয়ে যদি ঘরটা পরিষ্কার করা হয় তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পারব। সহযাত্রীর কথা কারোকে বলব না।

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আমি ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম না।

সন্ধেবেলায় ডাক্তার আমার মত না পাল্টানোর কথা শুনে খুশী হলেন না। আমি কেবিনে ঢুকে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমার সহযাত্রীর মুখটা যেন বারবার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল খুঁজলে তাকে জাহাজের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি পোশাক পাল্টানোর সময় হঠাৎ পোর্টফোলিওটা খোলা দেখলাম। দেখে মেজাজ যেন সপ্তমে চড়ে গেল। তখন আমি স্টুয়ার্ট রবার্টের খোঁজে নিচে নামলাম। আমি তাকে ধিক্কার জানিয়ে বললাম যে, জাহাজ যদি রাত্রিতে একপাশে কাত হয়ে থাকে এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ে যদি জল ঢুকতে থাকে তখন ১০টা লোক আপ্রাণ চেষ্টা করে এটা বন্ধ করতে পারবে না। আমি তোমার নামে ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করব।

রবার্ট বলল যে এ জাহাজে কেউ এ পোর্টফোলিওটা রাত্তিরে বন্ধ করে রাখতে পারে না। পেতলের ভারি ছিটকিনি দিয়ে আটকালে?

রবার্ট বলল, আপনি নিজে দেখুন ঠিক আছে কিনা। রর্বাট বলল যে, রাত্রিতে এটা আপনা থেকে খুলে যায়।

আমি বললাম, তাই যদি হয় তাহলে আমি তাকে এক পাউণ্ড বকশিস দেব। আমি রবার্টের কথা বিশ্বাস করলাম না। ব্যাপারটা আমি ওর চালাকি বুঝলাম। মিনিটের মধ্যে পোশাক পাল্টে আমি শুয়ে পড়লাম। নানারকম চিন্তা আসছিল মাথায়–এফোড় ওফোঁড় হয়ে ভাবছি এবং প্রায়ই আমার চোখ পোর্টফোলিওর দিকে পড়ছে।

ঘন্টা-দেড় ঘন্টা নাগাদ একটা ঝিমুনির মতো এলো এবং একটা ঠান্ডা বাতাসে যেন উড়িয়ে দিল। আমার গায়ে সমুদ্রের জলের ছাট লাগল। চমকে উঠে বসতে গিয়ে লাফিয়ে নামতে যাব, হঠাৎ জোর আছাড় খেয়ে গদিমোড়া কুসিটায় পড়লাম, ওটা পোর্টফোলিওর নিচে ছিল। আমি দেখলাম পোর্টফোলিওটা খোলা।

কিছুটা শ্রান্তি জড়ানো থাকলেও ঘুম চোখ থেকে উধাও হয়েছিল। পরের দিন দেখলাম ব্যাপারটা ঠিক নয়। এটা খোলা দেখতে আমি ভয় পেলাম না অবাক হলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথায় ঢুকছিল না কিভাবে এটা খুলল। তাছাড়া কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে সফেদ ঢেউগুলো এমন কিছু উত্তাল নয় যে চাপে খুলে যাবে। জানালাটা খোলে কিনা দেখার জন্য চুপচাপ দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণ পর একটা অস্ফুট চাপা গোঙানি শুনতে পেলাম। চকিতে ঘুরে ওপারের বিছানার পর্দা সরিয়ে হাত বোলাতেই বুঝতে পারলাম কে যেন শুয়ে আছে। যেন হিমঘরের মতো হাতটা। সমুদ্র ঝঝির থেকে একটা আঁঝালো গন্ধ ভেসে এলো। মানুষের হাতের মতো জিনিষটা মসৃণ, বরফের মতো ঠান্ডা। হাতটা ধরে টানতেই পার্থিব শক্তিতে প্রচণ্ড জোরে লোকটা মেঝেতে আছড়ে ফেললো। ভয় পাবার আগে অচেনা লোকটা দরজা খুলে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে আমি ওকে অনুসরণ করলাম। ঠিক আগে জাহজের পেছন দিয়ে ছায়ামূর্তি ছুটে যাচ্ছে। পরক্ষণে ছায়াটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। শুনতে পেলাম না জলে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

কোনোরকমে কেবিনে ফিরলাম। দেশলাই হাতড়ে হাতড়ে জ্বালিয়ে দেখলাম পোর্টফোলিওটা খোলা বুকের ভেতরের আতঙ্কে শরীরে কেঁপে উঠল। যেটা আগে কখনও অনুভব করিনি। বার্থটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করলাম। ভালো করে দেখার জন্য পর্দাটাকে টেনে সরালাম। বিছানা শুকনো হাড়ের মতো খটখটে ছিল। পোর্টফোলিওটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগালাম এবং শক্ত ও কাঠের লাঠিটাকে পেতলের গর্তের মধ্যে গুঁজে দিলাম। সারা রাত আলো জ্বালিয়ে পাহারা দেবার ভঙ্গিতে বসে রইলাম। রাত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পাল্টে ডেকে চলে এলাম। সমুদ্রের উপর ঠান্ডা বাতাস বুক ভরে নিলাম।

ডাক্তার আমার মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন যে রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি। তাই তিনি আমায় ঔষধ দিতে চান। তিনি আমার কথা অবিশ্বাস করলেন না বরং আমি যে তার কথা বিশ্বাস করি এটা তিনি বললেন। তাকে আমি আমার কেবিনে থাকতে বললাম। সে বলল, ভূতের সঙ্গে লড়ার দুঃসাহস আমার নেই।

ডাক্তারবাবু বলতে চান জাহাজে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আমি আমার কেবিনে থাকতে পারব। আমি কিন্তু একটি রাত একা কাটাতে চাই। এরজন্য আমি ক্যাপ্টেনের শরণাপন্ন হলাম। তাকে বললাম যে যদি আলোগুলো তিনি জ্বালিয়ে রাখেন তাহলে আমি একাই চেষ্টা করব। ক্যাপ্টেন বললেন যে, তিনি সহযোগিতা করবেন। তার ধারণা কোনো

বদমাইশ লোক নিচের কেবিন থেকে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাচ্ছে এবং যাত্রীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করছে।

এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি একটা ছুতোর দিয়ে বিছানাপত্তর খুলে কাঠের স্ক্রু খুলে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। কোন জায়গায় তক্তা খুলে গেছে, তাও পোলাম না। পোর্টফোলিওর কোথাও ত্রুটি নেই।

শর্তানুযায়ী রবার্ট টাকা দিল। ছুতোরটি আমায় বলল যে, চার-চারটে তাজা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেছে। মিছিমিছি দেরি না করে যেন আমি অন্য কেবিনে যাই। আমি গণ্ডা তিনেক ভ্রু দিয়ে দরজা সেঁটে দিচ্ছি।

আমি এটা করব একটা রাত, বললাম। রাত দশটায় ক্যাপ্টেন আমার ঘরে এলেন। তিনি সবদিক নিরীক্ষণ করলেন এবং মউজ করে চুরুট জ্বালালেও, ভেতরে অন্ধকার থাকার জন্য দেওয়ালে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখলাম। এখান থেকে কোনো মানুষের ঢোকা বা বেরুনো সম্ভব নয়, যদি তা ঘটে মনে হবে তা অতিপ্রাকৃতিক কিছু।

ক্যাপ্টেন বললেন যে এই কেবিনের ওপরের বার্থে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি পাগল হয়ে যান। সারাদিন তিনি চুপচাপ থাকতেন। একদিন হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমরা জাহাজ থামিয়ে নৌকা নামিয়ে তার কোনো খোঁজ পেলাম না। ভদ্রলোক পাগল ছিলেন বলে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি। এর পর দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল।

শোনা যায় পোর্ট জোন থেকে গলগল করে জল ঢুকছে। অনেক কষ্ট করে তা যদিও বন্ধ করা গেল গন্ধটাকে তাড়ানো গেল না।

আমি বললাম সকালে গন্ধটা ছিল না কিন্তু হঠাৎ আবার পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ লণ্ঠনটা নিভে গেল। তখন জাহাজটা দুলছে। হঠাৎ কি হলো আমরা দেখতে যাব। হঠাৎ আর্তনাদ করে পোর্টজোনের দিকে ছুটে গেলাম। ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রাণপণ শক্তিতে পোর্টহোলকে ঠেলে রাখার চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি কুর্সিটার উপর ছিটকে পড়ি এবং ক্যাপ্টেনকে দরজার গায়ে আছড়ে ফেলল যেন কেউ।

আমরা দেখলাম পোর্টহোলটা খোলা। উপরের বার্থে যেন কিছু দেখা যাচ্ছিল।

উপরের বার্থে দেখা গেল যেন দীর্ঘদিন জল ঢুকে থাকা ঠাণ্ডা ও মসৃণ। দুর্মর শক্তিতে পিছোল হাতটাকে আমি আঁকড়ে রাখলাম। পলকের জন্য ভয়ঙ্কর দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলে উঠল, অসহ্য যন্ত্রণায় আমি ঝাঁকিয়ে উঠলাম, একটা ছায়ামূর্তি দরজার দিকে গেল। ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে দিয়ে, ক্যাপ্টেন আগে থেকে তৈরি থেকে তাকে একটা ঘুসি মারতেই তিনি শক্ত মেঝেতে পড়ে গেলেন।

আমি আঁৎকে উঠলাম, নিঃশব্দ, মনে হলো ছায়ামূর্তিটা দরজার সামনে দাঁড়ানো এবং পোর্টহোল দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাতটাতে যন্ত্রণা হচ্ছিল। কোনোরকমে আলো জ্বালোম। ক্যাপ্টেন আঘাতে খুব ভয় পেয়েছিলেন। তাকে জলের ঝাঁপটা দিয়ে সুস্থ করা হলো।

এর পরে ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সমুদ্রযাত্রায় বাকি পথটা ডাক্তারের কেবিনে পাড়ি দিতে হলো। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে সারালেন এরপর জাহজের ১০৫ নং বার্থ সর্বকালের জন্য বুক করা হলো এই বলে যে আমরা দুঃখিত ওটা আগে থেকে ভর্তি হয়ে গেছে। বার্থটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করা ওই বিদেহী আত্মার জন্য সুসংরক্ষিত। তবে আমি আর কখনও কামশ্চাকায় উঠিনি।

মৃত মানুষের আঙুল

প্রাতঃরাশ সাজানো হতেই মিসেস হিগিনসনের হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে ক্যারোশার হলঘরে চলে এলো।

মিসেস হিগিনসন তাকে সর ফেলতে নিষেধ করলো। কিন্তু ক্যারোশার হাত চলকে দুধ পড়ে গেল তার লজ্জাবরণীর উপর। কিন্তু তখন তার তা পরিষ্কার করার সময় নেই, তারপর দোতলায় গিয়ে দেখবে মিস্ আমানদা রেগে আছেন।

মিস আমানদার ঘরের সামনে এসে ক্যারোশা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার নিজেকে কেমন যেন দুর্বল লাগছে। সে ক্লান্ত বোধ করলেও নিজের সাজপোশাক ঠিক করল টুপিটাকে মাথার পেছনে ঠেলে দিল। পেয়ালাটাকে একটু সরিয়ে দিলো। এখানে আজ ওর প্রথম দিন।

ক্যারোশা এরপর ট্রে তুলে নিয়ে অন্য দরজায় সংকেত দিলো। ওদিক থেকেও সাগ্রহে সাড়া আসল যেন তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ক্যারোশার আজ কাজের প্রথম দিন ছিল। সে ঘরের ভেতরে এসে বিছানার পাশে ছোট টেবিলে রাখলো।

মিসেস আমানদা বৃদ্ধা। মোটা, অসম্ভব ফ্যাকাসে। ওই মহিলা গত ৪০ বছরের মধ্যে হাঁটাচলা করা তো দূরের কথা বিছানার থেকে ওঠেননি। মুখটা রক্তশূন্য, পর পর বালিশ রেখে তিনি এমন ভাবে শুয়ে আছেন দেখলে মনে হয় মাথার নিচে কারোটি বলতে কিছু

নেই। গলা পর্যন্ত সুতির চাদর দিয়ে ঢাকা। সারা দেহে তুষারের পাহাড়ের মতো খাঁজখোঁজ। সমস্ত অবয়বের মধ্যে কেবল কোটরে ঢোকা কুকুতে চোখ দুটো সজীব।

উনি ক্যরোশাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে নতুন কিনা। উত্তর এলো যে হ্যাঁ, সে অত্যন্ত কমবয়সী। মাত্র ১৬ বছর বয়স তার! যখন তাকে তার গিন্নিমা বয়সের কথা বলল সে বেশ অবাকই হলো।

মিস আমানদা তিন-তিনটে ঘড়ি একসাথে বেজে ওঠায় সে খুব ভয় পেল। কিন্তু ক্যরোশা চমকে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল ঘরে থেকে সে পালায়, কিন্তু পা-দুটো ঝিমঝিম করল। তাই সে নড়তে সাহস পর্যন্ত পায়নি। তাছাড়া ব্যাপারটা খুব অশোভন।

মিস আমানদার হাসিমুখ যেন রাগিয়ে দিল তাকে। আমানদা বললেন যে, তাকে দেখতে ভালো নয় তবে বয়সটা কম হলে সবাই পছন্দ করছে, তাকে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। কালো চুল, ফুলের মতো মসৃণ গা। তার বিয়ের প্রস্তাব একশোটা এসেছিল। কিন্তু তিনি পঙ্গু হয়ে রয়েছেন। ক্যরোশা কি করবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু বুড়ির জন্য তার কোনো অনুকম্পা জাগছিল না। সেই মুহূর্তে মিসেস হিগিনসনের কাছে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমানদার অনুমতি ছাড়া যাওয়া অসম্ভব।

আমানদা জিজ্ঞাসা করলো তার কোনো প্রেমিক বন্ধু আছে কিনা। ক্যরোশা সম্মতি জানাল। মিস আমানদা ক্যরোশার মুখের দিকে তাকাতে সে অস্বস্তি বোধ করল। ওর

ডান হাতের কড়ে আঙুলটা আলাদা আর ভীষণ ছোট! ক্যরোশার মনে হলো অস্থিবিহীন একটা সোহাগী সাপ তার হাতকে পেঁচিয়ে উঠছে।

ক্যরোশাকে বললেন যে, তুমি যা ভাবো, আর পাঁচজন বুড়ির মতো সে ততটা খারাপ নয়। খাওয়া পরা ছাড়া মানুষের জীবনে আরও অনেক কিছু আছে, যার কথা আমি ভাবি। ক্যরোশা শুধু যুবতী হয়ে ভাবছে–এতটা স্বার্থপর যেন সে না হয়।

ক্যরোশা তার কথায় চমকে উঠল। তার প্রেমিকের নাম ডোনাল্ড, সে বলল। ডোনাল্ড লম্বা, ভালো স্বাস্থ্য। ক্যরোশার কাছ থেকে মিস আমানদা জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে তার প্রেমিক তাকে ভালোবাসে।

এইসব করোশারের মোটেই ভালো লাগছিল না। সে পালিয়ে যেতে চাইছিল, ছায়া ঘর, রোগশয্যা ঘড়ি ও ডান হাতের বাঁকা আঙুল সব কিছুই তাকে ক্লান্ত করে তুলল।

হঠাৎ মনে হলো মিস আমানদার উৎসাহ যেন এক ছুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। ক্যরোশার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ক্যরোশাকে নিচে যেতে বলা হলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ক্যরোশা চোখের জল আটকে রাখলো। ডোনাল্ডকে তার ডাকতে ইচ্ছে করল। যাকে সে ভালোবাসে। রান্নাঘরে ঢুকে ক্যরোশা দ্রুত হিগিনসনকে পাশ কাটিয়ে গেলো। সে চৌবাচ্চায় গিয়ে জল দিয়ে মুখ ধুতে লাগল,তার খেতে ইচ্ছে করছিল না।

হিগিনসন বুঝতে পারল বুড়ি তাকে কিছু বলেছে। সে বলল যে বুড়ির কাছে কাজ করা খুব মুশকিল। এটা খুব অদ্ভুত। এখানে প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে চলতে হয়, কেউ এখানে বেশিদিন থাকে না। বিশেষত কমবয়সী মেয়েরা। তারা কিছুদিন পর নকল করতে থাকে ম্যাডামকে। একবার একটি মেয়ে মিস আমানদার গলার স্বর নকল করত। হঠাৎ দুদিন যেতে না যেতে সে আত্মহত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে। কোথাও কোনো কারণ নেই। অন্য লোক তো দূরের কথা, পুলিশ কিছু বুঝতে পারল না, ক্যরোশার দুচোখ ভরে জল আসছিল। মিসেস হিগিনসন তাকে বুড়ির কথায় কান না দিতে বললেন।

যতটা সময় গেল ক্যরোশার মাথার যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। সে অন্যমনস্ক হলো। সে বাসনকোসন ধুলো, কুটনো কুটল তারপর তার কাজ সারল। দু-একটা মামুলি কথা ছাড়া মিস আমানদা মুখ খোলেননি। ও যেন একটা চিন্তার মধ্যে ছিল। তার শুধু মনে হচ্ছিল যে আটটায় ডোনাল্ড তার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।

দাঁত চেপে সে খাবার নিয়ে ওপরে উঠতে গেলো তার পা থেকে মাথা এমন জ্বলে গেল যে হাত থেকে ট্রে-টা কেঁপে গেল। মিস আমানদা তাকে বকবেন বা আদর করবেন এটা মনে হচ্ছিল, ক্যরোশা তখন মনে মনে খুশী হয়েই ভাবছিল। ডাইনিবুড়ির উপর চোটপাট করতে করতে ও ঘর ছেড়ে বেরুবে, কিন্তু তা কিছুই ঘটল না। ও মনে সাহস নিয়ে ট্রে-টা নামাল। ও কিছু বলতে পারছিল না। ওর যে কি হয়েছে ও নিজেই জানে না। জীবনে কখনও এরকম কষ্ট পায়নি।

রাত্তিরে সব কাজ শেষ করে সে ডোনাল্ডের জন্য অপেক্ষা করল, সবে কোটের বোতাম লাগাতে শুরু করেছে, হঠাৎ জানালা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা দেখতে পেলো–ডোনাল্ড চালক হয়ে চাবুক হাঁকাচ্ছে, ক্যরোশা ভাবল যে ডোনাল্ডকে যদি সব বলে দেয় এখুনি সে বাড়িতে আগুন ধরাবে। ক্যরোশা তাড়াতাড়ি টুপি পরল, মিস আমানদার ঘর থেকে ঘন্টি বেজে উঠল।

হিগিনসন বললেন যে, ক্যরোশাকে ডাকা হয়েছে। তাকে বলবেন উপরে উঠে দেখা করতে। তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবেন। ক্যরোশা ভেবেছিলো আর ওই বুড়িটার সঙ্গে দেখা করতে হবে না। তবুও তাকে করতে হবে।

তাকে ম্যাডাম বললেন যে, সে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, এ সময় তার সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত। এ বিষয়টা ক্যরোশার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। ডোনাল্ডের কথা জিজ্ঞেসা করলেন ম্যাডাম।

গিন্নিমা কিছু চান কিনা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বালিশ কমাতে বললেন। এটা করে চলে যাবার মুহূর্তে মিস আমানদা শক্ত করে ওর কাঁধ টানলেন ও বিছানায় টেনে আনলেন। ওর হাতে এত শক্তি থাকতে পারে ক্যরোশা স্বপ্নেও ভাবেনি। ক্যরোশা মুক্তি চাইছিল। তার মাথা যন্ত্রণায় কাঁপছে। ম্যাডাম বললেন যে তাকে ছাড়া হবে না। তুমি কখনও বন্ধুর কাছে ফিরতে পারবে না। ও জানতে পারবে না তুমি ক্যরোশা নও।

ক্যারোশার ভায়ানক অস্বস্তি লাগল। চীনা ঘড়ির বাজনা, অন্ধকার হওয়ার পর মনকে আরো অদ্ভুত করে তুলল। কয়েক মুহূর্ত পরেই চোখের কোটর ছাড়া ও মিস আমানদার মুখটা দেখতে পেলো না। তারপর চোখের কোটর অন্ধকার কোথায় মিলিয়ে গেল।

ঘরের পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার পায়ে পাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল যন্ত্রণা। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলো লেপতোষকের মধ্যে ও শুয়ে আছে। ওর সামনে মিস আমানদা দরজা খুলে বেরোচ্ছেন। সে পায়ের শব্দ শুনলেও তাকে অনুসরণ করতে পারল না। এমন কি বিছানা থেকে উঠে সে আয়নায় মুখ দেখবে তারও কোনো উপায় নেই। তার ডান হাতের কড়ে আঙুল ছোট হয়ে কেন বাঁকল সে বুঝল না। তবে সে যে আর মুক্তি পাবে না তা বুঝতে পারল।

ডোনাল্ডের কথা মনে হতে সে জানালা দিয়ে দেখল যে ডোনাল্ড গাড়ির উপর বসে রয়েছে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ও হাসছে।

ক্যারোশা স্পষ্ট শুনল ডোনাল্ডের ভরাট কণ্ঠস্বরে। সে বলছে যে তোমার জন্য বসে আছি। ক্যারোশা তাকে দেখে চিৎকার করে বলল চোর চোর। হিগিনসন ঝড়ের মতো ছুটে এলেন। তিনি শুনলেন যে মেয়েটি আংটি নিয়ে পালাচ্ছে।

হিগিনসন বাইরে গিয়ে টেনে হিঁচড়ে মেয়েটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। ডোনাল্ড মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধ বনে গেল। হিগিনসন মেয়েটাকে ঘরের মধ্যে এনে ফেলল।

ডোনাল্ড ঘন ঘন দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। সে কিছুই করতে পারছিল না। একটু পরে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। একসময়ে দরজা ঠেলে হিগিনসন মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিল।

ক্যরোশা তাকে দেখতে মিসেস হিগিনসন বলল, সে তার থেকে আংটিটা আদায় করতে পারে। তবে পুলিশে খবর দিতে পারেন। ক্যরোশাকে বললেন মিস আমানদা যে এভাবে তাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। তার মতে সবই বাক্সে আছে যা পুলিশ জানতে পারলে তাকেই নিয়ে টানাটানি করবে। সে ডোনাল্ডের কাছে যাবে।

ক্যরোশা নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। ক্যরো-র গলাটা ধরে ফেলল। ওর মাংসল হাতদুটো যে এত ক্ষিপ্ত গতিতে ছুটে যেতে পারে সে সম্পর্কে ক্যরোশার ধারণা ছিল না। তক্ষুনি আমানদার গলায় সে টিপে দিল।

হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ এল। ভারী বুটের শব্দ যখন বারান্দা পেরিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়াল তখন ক্যরোশা অমানুষিক মেয়েটির গলা টিপে আছে। ডান হাতের কড়ে আঙুলটা অদ্ভুতভাবে উঁচিয়ে আছে।

হিগিনসন বললে যে, ভদ্রমহিলা প্রায় ৪০ বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছেন তাকে যদি সাহায্য করতে না পারলেন তাহলে দেশে আইনশৃঙ্খলা থাকার কি প্রয়োজন।